কোন সার্বভৌম রাষ্ট্রের ওপর কেউ নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে না

বাংলাদেশের নির্বাচন ‘অবাধ ও সুষ্ঠু’ করার লক্ষ্যে কেউ যেন বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ভিসানীতির আওতায় ফেলেছে বাংলাদেশকে। যদি এমন কেউ ভিসার জন্য আবেদন করে যিনি বাংলাদেশের নির্বাচনকে বাধাগ্রস্থ করতে চায় বলে প্রমাণিত হয়, তবে তিনি ভিসা নাও পেতে পারেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের ভালোর জন্য এই উদ্যোগ নিয়েছে। তবে একথা না বলে উপায় থাকে না যে- যুক্তরাষ্ট্র অন্যদেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করে এমন আমার জানা নেই। তারা যেকোন সিদ্ধান্ত নেয় নিজের স্বার্থ রক্ষায়। এই প্রক্রিয়ায় তাদের অন্যতম একটি অস্ত্র হলো ‘স্যাংশন’। যেকোন উদ্ভুত পরিস্থিতিতে কোন দেশকে শাস্তি দিতে হলে, বা যুক্তরাষ্ট্র কাউকে শাস্তি দেবে মনে করলে তখন এই অস্ত্র প্রয়োগ করে।

প্রশ্ন হলো, এইটা কোন রাষ্ট্র কখন পারে? বা আদৌ তারা কীভাবে পারে? একক কোন দেশ, অন্য কোন সার্বভৌম দেশের ওপর স্যাংশন দেয়া আইনভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে কাজ করে। তথাকথিত চিন্তা হলো- বিশ্বের সব দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে একটি সংস্থা কাজ করে। সেটি হলো জাতিসংঘ। তাকে পাশ কাটিয়ে কোন একটা দেশ অপর দেশের ওপর যখন তাদের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে চায়, তখন সে তার অস্ত্র হিসেবে স্যাংশনকে ব্যবহার করে। যুক্তরাষ্ট্র যখন সেই সিদ্ধান্ত নিতে চায় তখন সে খেয়াল করে ওই দেশের সঙ্গে মেজরিটি কান্ট্রি আছে কিনা? সেসব বিচার করে আমেরিকা সিদ্ধান্ত নেয়।

আমি মনে করি, বর্তমানে স্যংশনের নামে যেটা ব্যবহার করা হচ্ছে, সেটা আসলে জনগনকে শাস্তি দিচ্ছে। বাংলাদেশের সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে আপনি স্যাংশন আরোপের কথা বলছেন বা বাস্তবায়ন করছেন ঠিকই, কিন্তু আসলে সেটা যখন করছেন তখন এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে কস্ট দেওয়া হচ্ছে। ভুলে গেলে চলবে না, বাংলাদেশের মানুষের কস্টে থাকার অভিজ্ঞতা আছে। আর এই দেশের মানুষের এও জানা আছে যে, ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা অর্জন করেছিলো তা আমেরিকার ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

আমেরিকা আসলে কেন এমন পরিস্থিতি তৈরী করলো? এবার একটু পিছনের

দিকে ফিরতে হবে। মুক্তিযুদ্ধে তারা বাংলাদেশের পক্ষ নেয়নি। শুধু তাই নয়, একটি যুদ্ধোত্তর দেশকে সামনে এগোতে নানা বাধা সৃষ্টি করেছিল। নিজের স্বাধীন দেশের জন্যে, বঙ্গবন্ধু যখন কিউবাতে গিয়ে তাঁর চটের বস্তা নিয়ে কাজ করতে চাইলেন তখন আমেরিকা বাধ সেধেছিলো। সেসময় তারা খাদ্য অনুদান দিতো, সেটি বন্ধ করে দেয়ায় বাংলাদেশে চরম খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয়। অনুদান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সেই মুহূর্তে খাদ্য ঘাটতি পূরণ করতে না পারায় খাদ্য সংকটে পড়েছিলো এই দেশ। সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছিল শ্রমজীবী মানুষ। লেখার শুরুতে যেটা বলছিলাম, আসলে শাস্তিটা পায় সাধারণ মানুষ।

অন্যান্য দেশের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ভেনেজুয়েলাতে তাদের স্যাংশনের কারণে ৪০ হাজার শিশু মারা গিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর একক সিদ্ধান্তে মারা গেলো ৪০ হাজার শিশু! এমন পরিস্থিতি যখন শুধু একটি দেশের ইচ্ছায় হয়, তখন কোন সম্মিলিত বিশ্বব্যবস্থা তা মানতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে এই স্যাংশন অস্ত্র যেভাবে কাজে লাগাতে চাইছে, সেটা আগামীদিনে কতটা কাজে লাগবে তা নিয়ে আমার শঙ্কা রয়েছে। কারণ স্যাংশনে পড়া অনেক দেশ সেটা ভেঙে ফেলতে চাইছে। যেমন ধরা যাক, ইউক্রেনের জন্য রাশিয়াকে যে স্যংশন তারা দিয়েছে, তা কি রাশিয়া মানছে? কিংবা ধরা যাক, উগান্ডা কিংবা নাইজেরিয়ার কথা।

ঠিক একইভাবে, বাংলাদেশে তারা এখন অবাধ সুস্ঠু নির্বাচনের কারণ দেখিয়ে স্যংশনের হুমকি দিল। প্রশ্ন হলো, তারা ‘অবাধ ও সুষ্ঠু’ নির্বাচনের কথা বলছে বটে, কিন্তু অবাধ পরিবেশ তৈরী করছে কি? বরং দেখা যাচ্ছে, যারা আমেরিকার ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাচ্ছে, তাদের বশে আনার উপায় হিসেবে স্যাংশন দিচ্ছে। তারা কার ওপর হুমকি দেবে, সেটা নিশ্চিত বোঝা কঠিন হয়ে যাচ্ছে কারণ, নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন অনেকের ভিসাও যে আমেরিকা দেয়নি সেই উদাহরণও আছে।

আরেকটি অমীমাংসিত প্রশ্ন হলো, কারা কী করছে যুক্তরাষ্ট্র কোথা থেকে সে তথ্য নিচ্ছে? সেই তথ্য একপেশে, না গ্রহণযোগ্য সেই বিবেচনা কে করবে? একজন তথাকথিত মানবাধিকারকর্মী আদিদুলের আইনের পথে বিচার হলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মাথা ব্যাথার কারণ হয় এবং তার পক্ষে সরব অবস্থান নেয়। কিন্তু সেই লোক যে ৬১ লাশের কথা বলে মিথ্যাচার করলো এবং সেই মিথ্যাচার যে একটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরী করলো, অরাজকতার চেষ্টা হলো, সেটা উল্লেখ না করে, বিবেচনায় না নিয়ে, প্রকারন্তরে সমর্থন দিলো! সেই বিষয়টা অন্ধকারে রেখেই কী বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি মূল্যায়ন হবে?

আসলে খোদ যুক্তরাষ্ট্র দেখতে পাচ্ছে যে এই স্যাংশন নিয়ে রাশিয়া, ইরান, উত্তর কোরিয়া ভাল আছে। মার্কিন নিয়ন্ত্রিত যে অর্থব্যবস্থা, তার বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত গড়ে উঠতে শুরু করেছে। ফলে এধরনের অস্ত্রের ব্যবহার, মার্কিনবিরোধী জোট তৈরীতে সহায়ক হবে। এই বোধ আমেরিকার থাকতে হবে। যদিও এ নিয়ে আমি তাদের উপদেশ দিতে চাই না। শুধু বলতে চাই, একপেশে তথ্যের ওপর ভিত্তি করে, কোন বিশেষ গোষ্ঠীকে সুবিধা দেবার জন্য স্যাংশনের মত কোন উদ্যোগ গ্রহণযোগ্য না। বাংলাদেশের জন্যে ভিসানীতি ঘোষণার পর দেখা গেছে, একপক্ষ আনন্দ নিয়ে উগ্রীব হয়ে আছে। এতেই বোঝা যায় এটি একটি রাজনীতি বিভাজন প্রক্রিয়া। যে কারণে এক পক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে জেনে খুশি হয়ে যাচ্ছে অন্যপক্ষ।

সেটা কি অবাধ নিরপেক্ষ পরিস্থিতি সৃষ্টিতে সহায়ক? এই পরিস্থিতি সংঘাতের কারণ হতে পারে। সেই দায় কে নেবে? ভুলে গেলে চলবে না যে, আরেক দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কারণে কোন সংঘাত হলে, এর দায় তাদের নিতে হবে। স্যাংশন বিষয়ে ঘোষণা আসার পরে বাংলাদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত পিটার হাস আবার সুনির্দিষ্ট করে বলছেন, এরমধ্যে গণমাধ্যমও পড়বে। আবার এরপর স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলছে, গণমাধ্যম পড়বে এমনটা এখনও না। এ ধরনের আলাপ তোলা, কোন রাষ্ট্রদূতের জন্যে কতটা কূটনৈতিক শিষ্টাচার? এই প্রশ্ন আমরা এখন তুলতেই পারি। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কথা বলার এখতিয়ার বিদেশি রাষ্ট্রের নেই। কিন্তু তারপরেও তারা এটা করছে, কেনো? এক কথায় এর জবাব হতে পারে, তারা এটা করছে শক্তি দেখানোর জন্যে।
তাদের শক্তি দেখানোর আরও একটি উদাহরণ আছে। সেটা হচ্ছে, পিটার হাস আরও বলেছেন, তারা

বাংলাদেশের বিচার বিভাগ পযবেক্ষণ করবে। কী অদ্ভুত! তারা কি জানে না, বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন? আপনি বিচারককে কীভাবে পযবেক্ষণ করবেন? তিনিতো কাজ করেন আইনের বিধিতে। বাংলাদেশ চলবে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র বা সংবিধানে। আমেরিকার নিয়মে তো চলবে না। পর্যবেক্ষণের মতো বিষয়গুলো সামনে এনে এরা এসব প্রতিষ্ঠানে রিতীমত বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরী করতে চাচ্ছে।

এখন আমাদের অবস্থান কী হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং সে অনুযায়ী অ্যাক্ট করা দরকার। সত্যিকথা বলতে, আমেরিকা মনে করে ভারত মহাসাগরে তার অবস্থান শক্ত করতে হলে বাংলাদেশকে তার লাগবে। কিন্তু বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্ক ভারসাম্যপূর্ণ, পররাষ্ট্রনীতি অনুযায়ী সে সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষার কথা বলে। এখন সেটা ভাঙতে

চাইলে বাংলাদেশকে নানারকম চাপ দেয়ার বিকল্প নেই। এখন এই অবস্থা বিবেচনা করে করণীয় ঠিক করাটা বাংলাদেশের জন্যে জরুরি।
লেখক: নিরাপত্তা বিশ্লেষক।

কক্সবাজার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন সমীক্ষা প্রকল্পের পরামর্শ প্রতিষ্ঠান নিয়োগের চুক্তিপত্র স্বাক্ষর

কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কউক) ও কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কনসাল্টেন্ট (সিএসসি) এর মধ্যে “কক্সবাজার জেলার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের পরামর্শ প্রতিষ্ঠান নিয়োগ সংক্রান্ত চুক্তিপত্র স্বাক্ষর হয়েছে। এই প্রকল্পে কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কনসাল্টেন্ট (সিএসসি) এর সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে সেলট্রন ইএমএস এবং এহসান খান আর্কিটেক্টস।

মঙ্গলবার চুক্তিপত্র স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে কউক-এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কমডোর মোহাম্মাদ নুরুল আবছার, এনজিপি এনডিসি, পিএসসি, বিএন (অব.), লে. কর্নেল মো. খিজির খান পি ইঞ্জ, সদস্য (প্রকৌশল) লে. কর্নেল তাহসিন বিন আলম, পিএসসি, ইঞ্জিনিয়ার্স এবং উপ নগর পরিকল্পনাবিদ ও “কক্সবাজার জেলার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মো. তানভীর হাসান রেজাউল। এছাড়া সিএসসি-এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সিএসসি-এর ডিরেক্টর (প্ল্যানিং এন্ড কনস্ট্রাকশন) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুল্লাহ-আল-মামুন ও “কক্সবাজার জেলার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক লে. কর্নেল সাদেক মাহমুদ।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “কক্সবাজার জেলার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পটির আওতায় কক্সবাজার জেলার ৮টি উপজেলা (চকরিয়া, পেকুয়া, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, কক্সবাজার সদর, রামু, উখিয়া ও টেকনাফ) এবং সমুদ্র সৈকত এলাকাসহ মোট ৬৯০.৬৭ বর্গ কি.মি. এলাকার ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান এবং কক্সবাজার জেলার ২৪৯১.৮৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকার জন্য স্ট্রাকচার প্ল্যান প্রণয়ন করা হবে। এছাড়া টেকসই যাতায়াত ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, পাহাড়, বন, জলাশয় ও সমুদ্র অঞ্চল সংরক্ষণ, সমুদ্র সৈকতের নির্দিষ্ট সীমানা সংরক্ষণ, অবৈধ ও অপরিকল্পিত স্থাপনা অপসারণ, জল ও স্থলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা হবে। পাশাপাশি পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দূষণ প্রতিরোধ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ, আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন সুবিধা নিশ্চিতকরণ, আবাসন ব্যবস্থা বিষয়ক পরিকল্পনা, সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্যবর্ধন ও ভূমিক্ষয় রোধকরণ করা হবে।

প্রকল্পটি ২০২২ সালের ২৭ ডিসেম্বর মোট ১৭৪.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে পরিকল্পনা কমিশন অনুমোদন দেয়। গত ১২ জানুয়ারি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মেয়াদকাল এপ্রিল ২০২১ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত।

মেহেরপুরে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সংবাদ সম্মেলন

দীর্ঘদিন ধরে নানা বঞ্চনা ও বৈষম্যের অভিযোগ তুলেও সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া না পাওয়ায় এবার কর্মবিরতিতে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নেতারা।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১১টার সময় মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নেতৃবৃন্দ দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুরেও সংবাদ সম্মেলন করে তাদের দাবি ও পরবর্তী কর্মসূচীর ঘোষণা দেন।

সংবাদ সম্মেলনে জেলা বিসিএস শিক্ষা সমিতির সভাপতি সহযোগী

অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু বলেন, প্রধানমন্ত্রী সকল ক্যাডারের জন্য সুপার নিউমারি পদে পদোন্নতি দিয়ে ক্যাডার বৈষম্য নিরসনের নির্দেশনা দিলেও তা পালিত হয়নি, আন্ত ক্যাডার বৈষম্য নিরসনের নির্দেশনা বারবার দেওয়া হলেও সে নির্দেশনা মানা হচ্ছে না। শিক্ষা ক্যাডারের গ্রেড উন্নয়নের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাও কার্যকর করা হয়নি।

তিনি দাবী জানিয়ে বলেন, শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকালকে নন ভেকেশন সার্ভিস ঘোষণা কেও পূর্ণ গড় বেতনে অর্জিত ছুটি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে শিক্ষা ক্যাডার নিয়ন্ত্রিত জেলা ও উপজেলা শিক্ষা প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

তিনি বলেন, এসকল দাবী নিয়ে কেন্দ্রীয় বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির নির্দেশনা অনুযায়ী ২ অক্টোবর সারাদেশের ন্যায় মেহেরপুরেও এক দিনের কর্মবিরতি পালন করবেন তারা। এই কর্ম বিরতি শুধুমাত্র সরকারি কলেজগুলোতে পালন করা হবে। এরপরও দাবি পূরণে দৃশ্যমান অগ্রগতি না হলে আগামী ১০, ১১ ও ১২ অক্টোবর টানা তিন দিনের কর্মবিরতি পালন করা হবে।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মেহেরপুর জেলা কমিটির সভাপতি আব্দুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতুর নেতৃত্বে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক শফিউল ইসলাম সরদার, সহযোগী অধ্যাপক ও বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির মেহেরপুর জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক খেজমত আলী মালিথা, সহযোগী অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, সরকারী অধ্যাপক মইনুল ইসলাম, সিরাজ উদ্দিন, নজির আহমেদ সিদ্দিকী সহ শিক্ষক নেতারা।

যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা

কোন দেশকেই দমাতে পারেনি, বাংলাদেশকে পারবে?

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর গত সাড়ে তিন দশক ধরে পৃথিবীতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ইরাক থেকে শুরু করে সিরিয়া, হালের ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধেও বাতাস দিচ্ছে তারা। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই থাবা থেকে বাদ যায়নি আফ্রিকার দেশগুলোও। যখন যেখানে নিজেদের স্বার্থের বিষয় এসেছে, সেখানেই যুক্তরাষ্ট্র নানান কৌশল আর ছলচাতুরি আশ্রয়ে হস্তক্ষেপ করেছে। জারি করেছে নানা ধরণের স্যাংশন বা নিষেধাজ্ঞা।

সম্প্রতি বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচনের তিন মাস আগে জারি করলো ভিসা নীতি। বিশ্বের বেশিরভাগ রাজনৈতিক বিশ্লেষক বলছেন, এটা তারা করেছে নিজেদের স্বার্থে এবং ভূ-রাজনৈতিক কারণে। শুধু তাই নয়, এর মাধ্যমে তারা বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সরাসরি হস্তেক্ষেপ করলো। গণতন্ত্র, মানবাধিকার রক্ষা আর সুষ্ঠু, অবাধ ও অংশগ্রহণমূলক ভোটের অজুহাত দিয়ে, বাংলাদেশের উপর ছড়ি ঘোরানোর চেষ্টা করলো যুক্তরাষ্ট্র। এর পেছনের গল্প হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থা এখন ভাল নয়। তাই তাদের লক্ষ্য বিশ্ববাসীর দৃষ্টি ঘুরিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে নিজের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল করা।

বিশ্লেষকরা আরও বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রের শেষ দু’টি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট কারচুপির অভিযোগ উঠছে। এখন সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে নানাভাবে ঘায়েল করছে তৎপর বাইডেন প্রশাসন। নিজেদের দেশের এসব অগণতান্ত্রিক আচরণ নিয়ে মাথা না ঘামাচ্ছে না যুক্তরাষ্ট্র। উল্টো নিজের মোড়লিপনা জাহির করে সেসব অপকর্ম ঢেকে দেয়ার চেষ্টা করছে।

একটু পিছনের দিকে গেলে দেখা যায়, আজকে যে স্যাংশন বা নিষেধাজ্ঞার সংস্কৃতি চালু হয়েছে, এর শুরু হয়েছিল নব্বই এর দশকে এই যুক্তরাষ্ট্রের হাত ধরেই। বিশ্ব জুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের এই ‘স্যাংশন পলিটিক্স’ এখন ভয়াবহ রূপ ধারন করেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক জর্জ লোপেজ যুক্তরাষ্ট্রের এই স্যাংশন পলিটিক্সকে নব্বইয়ের দশককে ‘স্যাংশন ডিকেডস’ হিসেবে চিহ্নিত করেন। বিশ্লেষকদের দাবি, মানবাধিকার বা গণতন্ত্রের কথা বলে স্যাংশন দেয়া হলেও বেশিরভাগ

সময় ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থসহ অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় এখানে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

যুক্তরাষ্ট্রে পাবলিক ইউনিভার্সিটি সিস্টেমের স্কুল অফ সিকিউরিটি অ্যান্ড গ্লোবাল স্টাডিজের অধ্যাপক সায়ীদ ইফতেখার আহমেদ মনে করেন, ‘মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্যাংশন’ এর ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কথা বললেও অনেক দেশ, যারা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখে তাদের ব্যাপারে চুপ থাকে। যেমন ‘সৌদি আরব’। সেখানে মানবাধিকার বা গণতন্ত্র না থাকলেও যুক্তরাষ্ট্র কখনই তাদের নিষেধাজ্ঞা দেয় নি।

একইভাবে যদি আমরা পাকিস্তানের দিকে তাকাই, তাহলে দেখা যাবে দেশটি সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ, উগ্র রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং সেনা হস্তক্ষেপে বিপর্যস্ত। সেখানেও দীর্ঘদিন গণতন্ত্র নেই। তারপরেও পাকিস্তানকে যুক্তরাষ্ট্র স্যাংশন দেয় না। উল্টো আমেরিকার গণতন্ত্র সামিটে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ পাঠায়।

এখন আমরা নির্দিধায় বলতে পারি, আমেরিকা নিজেদের স্বার্থ ও আধিপত্য বিস্তারের জন্য স্যাংশন দিচ্ছে। এক্ষেত্রে কোথাও মানবাধিকার লঙ্ঘন, কোথাও গণতন্ত্র বনাম স্বৈরতন্ত্র, আবার কোথাও সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব বিভাগের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ৯ হাজার ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং কিছু খাতের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। ওই বছরই বাইডেন প্রশাসন বিশ্বব্যাপী আরও ৭৬৫টি নতুন নিষেধাজ্ঞা দেয়। এরমধ্যে ১৭৩টি ছিল মানবাধিকার ইস্যুতে।

যেসব দেশ যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞায় পড়েছে, বৈশ্বিক উৎপাদনে সেই দেশগুলোর অবদান প্রায় এক–পঞ্চমাংশ। এই উৎপাদনের ৮০ ভাগ দাবিদার চীন। কোনো নিষেধাজ্ঞা দিয়েই চীনকে দমাতে পারছে না যুক্তরাষ্ট্র। অর্থাৎ চীনের উপর যতো নিষেধাজ্ঞা দেয়া হোক সেগুলো কোন কাজে আসছে না।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র এ পর্যন্ত এক হাজার ৯৪৮টি নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রের পথ ধরে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে সুইজারল্যান্ড ও কানাডা। এপর্যন্ত তারা যথাক্রমে এক হাজার ৭৮২টি এবং এক হাজার ৫৯০টি নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। কিন্তু রাশিয়া

অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী হওয়ায় এই নিষেধাজ্ঞা তেমন কোন প্রভাব ফেলেনি। বরং তাদের অর্থনীতি অনেক বেশি টেকসই ও মজবুত হয়েছে।

মজার বিষয় হচ্ছে, রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা দিলেও সেগুলো শতভাগ কার্যকর করতে পারেনি নিষেধাজ্ঞা দেয়া দেশগুলো। যেসব পণ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে, সেগুলো কোনো না কোনোভাবে রাশিয়ায় যাচ্ছে এবং ইউক্রেন যুদ্ধে ব্যবহার হচ্ছে। অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞা যারা কার্যকর করবে সেই ইউরোপ নিজেদের স্বার্থে সেটা করছে না। তারা কোনোভাবেই নিজেদের ব্যবসা নষ্ট করতে চাইছে না।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের ১২টি দেশ, নরওয়ে, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ২০২২ সালে এসব দেশ রাশিয়ায় কাছে সাড়ে ৮ বিলিয়ন ডলারের পণ্য বিক্রি করেছে। যেগুলোর উপর রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছিল। নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা পণ্য রপ্তানিতে জার্মানি প্রথম এবং লিথুয়ানিয়া দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে।

আবার রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের আগে ইরান ছিল বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত রাষ্ট্র। ইরানের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ছিল তিন হাজার ৬১৬টি। পশ্চিম এশিয়ার এই দেশটির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ভারত ও ইসরায়েলের মতো দেশ এই নিষেধাজ্ঞা জারি করে। বছরের পর এতো নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও ইরানের অর্থনৈতিক অগ্রগতি আমেরিকা বা তার মিত্ররা থামাতে পারেনি। একই অবস্থা কিউবা, মিয়ানমার, উত্তর কোরিয়া, সিরিয়া ও ভেনেজুয়েলার ক্ষেত্রেও।

মোদ্দা কথা কোন নিষেধাজ্ঞাই এসব দেশের অর্থনীতি ধ্বসিয়ে দিতে পারেনি। বরং বিকল্প পথ তৈরি হয়েছে। এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিকল্প পথের নেতৃত্ব দিচ্ছে রাশিয়া ও চীন। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের জারি করা ভিসা নীতি নিয়ে আরও সোচ্চার হওয়ার সুযোগ এসেছে বাংলাদেশের। এখন বাংলাদেশ নিজেদের প্রমাণ করার এই সুযোগটি কাজে লাগাতে পারে।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

গণমাধ্যমেও মার্কিন ভিসানীতি: সাংবাদিক নেতাদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশের গণমাধ্যমও মার্কিন ভিসানীতির বিধিনিষেধের আওতায় পড়তে পারে- পিটার হাসের এমন বক্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সাংবাদিক নেতারা। তারা বলছেন, এটা গণমাধ্যমে ভীতির পরিবেশ তৈরি করবে। এটা কোনোভাবেই কাম্য নয়। তারা বলছেন, গণমাধ্যম স্বাধীন সম্পাদকীয় নীতি নিয়ে চলে।

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গত শুক্রবার ভিসানীতি প্রয়োগ করে যুক্তরাষ্ট্র। তাতে বলা হয়, এই ভিসানীতির আওয়াতায় পড়বেন সরকারি দল, বিরোধী রাজনৈতিক দল, বিচার বিভাগ, প্রশাসন, আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা। এমন ঘোষণার দুই দিনের মাথায় রোববার ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস জানিয়েছেন, এই ভিসানীতির বিধিনিষেধের আওতায় বাংলাদেশের গণমাধ্যমও আসতে পারে।

পিটার হাসের এমন মন্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন সাংবাদিকে নেতা ও গণমাধ্যমকর্মীরা। বাংলাদেশ অবজারভারের সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী বলেন, “প্রশ্ন হলো- গণমাধ্যম সব সময় ন্যায় বিচার, মানবাধিকার, অপশাসন, অন্যায়, অবিচার, দুঃশাসনের বিরুদ্ধে কাজ করে। মানুষের ন্যায়ের পক্ষে কথা বলে। সেখানে বিধিনিষেধ আরোপ করা হলে একটা ভীতির পরিবেশ তৈরি হবে। এটা হলে স্বাধীন সাংবাদিকতা বাধাগ্রস্থ হবে।” ভয়-ভীতির পরিবেশের মধ্যে কাজ করা যায় না বলেও মন্তব্য করেন তিনি। বলেন, “এটা মেন আমাদের জন্য কাম্য নয়, কেমনি যারা বিধিনিষেধ আরোপ করবে তাদের জন্যও কাম্য নয়। ”

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ও দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত বলেন, “মিডিয়া কীভাবে একটা দেশের গণতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্থ করে সেটা আমার বোধগম্য নয়। একটা টিভি চ্যানেলে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস মিডিয়া বিষয়ে যা বলেছেন সেটা

পরিস্কার নয়। যারা স্বাধীন গণমাধ্যমের কথা বলে, গণতন্ত্রের কথা বলে- তারা কীভাবে মিডিয়ার বিষয়ে এমন কথা বলে, এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বলে?” তিনি বলেন, “যুক্তরাষ্ট্র যদি মিডিয়ার বিষয়ে এরকম কোনো সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে সেটা হবে দুঃখজনক এবং স্বাধীন গণমাধ্যমের উপর হস্তক্ষেপ।”

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের মহাসচিব দীপ আজাদ বলেন, “ভিসানীতি যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়। প্রতিটি গণমাধ্যম নিজস্ব সম্পাদকীয় নীতিতে চলে। বাংলাদেশে গণমাধ্যমের কল্যাণেই দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে বা ক্ষতিগ্রস্থ বা বাধাগ্রস্থ হচ্ছে সেটা দেশ-বিদেশের মানুষ জানতে পারে।

দীপ আজাদ বলেন, “যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের সময় সে দেশের গণমাধ্যমগুলো সে দেশের দল বা প্রার্থীকে সমর্থন দেয়। এটা তাদের সম্পাদকীয় নীতি। বাংলাদেশের কোনো গণমাধ্যম যদি গণতন্ত্র ধ্বংস বা ব্যহত করার এজেন্ডা নিয়ে কাজ করে সেটিকে আমরা গণমাধ্যম হিসেবে গণ্য করি না। সেটিকে আমরা সংগঠন বা ব্যক্তির মুখপাত্র হিসেবে গণ্য করি।”

ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আকতার হোসেন বলেন, “আমরা মনে করি এটি স্বাধীনতারে উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ। বাংলাদেশের সাংবাদিকরা স্বাধীন সাংবাদিকতায় বিশ্বাসী। মার্কিন রাষ্ট্রদূতের এমন বক্তব্য আমাদের সাংবাদিকতাকে বাধাগ্রস্থ করবে। স্বাধীন মত প্রকাশের এ ধরণের নিষেধাজ্ঞা বা হস্তক্ষেপ সাংবাদিকদের ভীত করে তুলবে।”

জঙ্গিবাদ বিষয়ে ‘জিরো টলারেন্স’ করে দেখিয়েছেন শেখ হাসিনা

নব্বইয়ের দশকের পর থেকে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটতে শুরু করে। বাংলাদেশের ইতিহাসে সশস্ত্র জঙ্গিবাদের উত্থানের সর্ববৃহৎ

আলামত দৃশ্যমান হয় ২০০৫ সালে জেএমবির ৬১টি জেলায় একযোগে বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে। এরপর সারা দেশে ছোট-বড় আরও অনেক সশস্ত্র জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছে। তবে সবচেয়ে ভয়াবহ ও নৃশংস ঘটনা ঘটে ২০১৬ সালের ১ জুলাইয়ে গুলশানে হলি আর্টিজান বেকারি রেস্তোরাঁয়। সেখানে ৫ জঙ্গিসহ ২৯ জনের প্রাণহানি ঘটে।

দুই দশকে এসব হামলার শিকার হয়েছেন খোদ বর্তমানের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশকে জঙ্গিগোষ্ঠীর হাত থেকে রক্ষা করতে তিনি ঘোষনা দেন জিরো টলারেন্সের। এটা যে কোন মুখের কথা ছিলো না তা বাংলাদেশ বুঝতে শুরু করেছে। একের পর এক জঙ্গি গোষ্ঠীর উত্থান, একের পর এক নৃশংস হামলার পেরিয়ে বাংলাদেশ এখন জঙ্গিমুক্ত দেশে পরিণত হতে চলেছে।

নানা চড়াই উৎরাইয়ের পর বিশ্বে জঙ্গিবাদ দমনে যে অনন্য নজির সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশ তার ক্যাপ্টেন বর্তমানের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০১৬ সালের ১ জুলাই গুলশানের হলি আর্টিজানে ভয়াবহ জঙ্গি হামলার পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দেশব্যাপী জঙ্গিবিরোধী অভিযানে এই সাফল্য অর্জন করেছে। বৈশ্বিক ইনডেক্সে হাই রিস্কের (উচ্চ ঝুঁকি) দেশ থেকে লো রিস্কের (নিম্ন ঝুঁকি) দেশে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ের বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র সংগঠন কুকি চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের (কেএনএফ) তত্ত্বাবধানে নতুন জঙ্গি সংগঠন জামায়াতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়া আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করলেও তা যৌথ বাহিনীর ব্যাপক অভিযানের মুখে অনেকটা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে।

গোবাল টেররিজম ইনডেক্স (জিটিআই)-২০২৩ প্রতিবেদন অনুযায়ী এর সূচকে বাংলাদেশ তিন ধাপ উন্নতি করেছে। অর্থাৎ দেশে সন্ত্রাসবাদ আরও কমেছে, দেশ নিরাপদ হয়েছে। সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে ভালো করা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়, এমনকি যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি ও ভারতের চেয়েও জঙ্গি দমনে ভালো করেছে বাংলাদেশ। জঙ্গিবাদ পুরাপুরি নির্মূল না হলেও জঙ্গি সংগঠনগুলোর মেরুদন্ড ভেঙে দিয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। তবে এখনও অনলাইনে সক্রিয় রয়েছে বেশকিছু জঙ্গি সংগঠন।

পুলিশ সদর দপ্তরের সূত্রে জানা গেছে, ২০০১ সাল থেকে ২০২৩ সাল গত ২২ বছরে সারাদেশে জঙ্গিবাদ বিষয়ক প্রায় ২ হাজার মামলা দায়ের করা হয়েছে। এসব মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৯ হাজারেরও বেশি জঙ্গি। এসব জঙ্গিরা হচ্ছে জেএমবি, নব্য জেএমবি, আনসার আল ইসলাম, হরকত-

উল-জিহাদ হুজি, হিযবুত তাহরির, জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়াসহ বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনের সদস্য। বিশেষ করে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিকল্পনা করে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে যার মধ্যে সন্ত্রাসবিরোধী আইন প্রণয়ন এবং প্রাসঙ্গিক আইন সংশোধন অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২০০৯-২০১৩ সালে, ব্লগার, লেখক, প্রকাশক, হিন্দু-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ পুরোহিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, মানবাধিকার কর্মী, ভিন্নমতের ইসলামী মতাদর্শের অনুসারী, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা এবং বিদেশীদের ওপর ধারাবাহিক আক্রমণ দেশে জঙ্গিবাদ বিরোধী কার্যক্রমকে চ্যালেঞ্জে ফেলেছিল। তবে এখনো পুরনো জঙ্গি সংগঠন জএমবি, আনসার-আল ইসলাম ও হুজিবি সংগঠিত হওয়ার সময়ে অনেক জঙ্গি গ্রেপ্তার হয়েছে। নব্য জেএমবির সর্বশেষ আমির মেহেদি হাসান জন তুরস্কে বসে সংগঠনটির নেতৃত্ব দিয়ে আসছিল। এ ছাড়া আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানের মুখে বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনগুলো কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।

বাংলা ভাইয়ের সন্ত্রাস, হরকাতুল জেহাদের হুমকি ধামকির বিপরীতে বিশুদ্ধ বাংলাদেশ ও জঙ্গিবাদ নির্মূল সম্ভব হয়েছে শেখ হাসিনার জিরো টলারেন্স নীতির কারণে। দেশে এখনো পর্যন্ত জেএমবি, শাহাদাত-ই-আল-হিকমা, জেএমজেবি, হিজবুত তাহরির, হুজি-বি, এবিটি, আনসার আল ইসলাম এবং আল্লাহ দল নামে আটটি জঙ্গি সংগঠনকে বাংলাদেশ সরকার নিষিদ্ধ করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সরকারের কঠোর ভূমিকার কারণে দেশের জঙ্গিবাদ নেটওয়ার্ক ধ্বংস করা সম্ভব হয়েছে।

বলতে দ্বিধা নেই, জঙ্গিবাদ দমনে ২০১৬ সালে গুলশানে হলি আর্টিজানে হামলার ঘটনার আগে জঙ্গি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ পুলিশের তেমন দক্ষতা ছিল না। এরপর গঠন করা হয় পুলিশের অ্যান্টি টেররিজম ইউনিট, ডিএমপির কাউন্টার-টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম, সাইবার ক্রাইম, ইনভেস্টিগেশন সেন্টার এবং পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের ইন্টারসেপশন ইউনিট জঙ্গিবাদ দমনে সরাসরি কাজ করছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও অনলাইনে জঙ্গিদের তৎপরতা ঠেকাতেও সতর্ক রয়েছে এসব বাহিনী।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বারবার বলেছেন, ‘বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ।’ এ দেশের মানুষ ধর্মীয় উগ্রবাদিতা ও তাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত জঙ্গিবাদকে ঘৃণা করে। শিশুদের জঙ্গিবাদ এবং

সন্ত্রাসবাদ থেকে দূরে রেখে একটি আধুনিক ও জ্ঞানভিত্তিক উন্নত জাতি গঠনে অবদান রাখতে হজযাত্রী এবং আলেম-ওলামাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমি আপনাদের (হজযাত্রীদের) এবং আলেম-ওলামাদের জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সাথে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাচ্ছি যাতে আমাদের শিশুরা এটি থেকে দূরে থাকতে পারে এবং উন্নত বাংলাদেশ গড়তে আধুনিক প্রযুক্তিতে প্রস্তুত হতে পারে। শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন, যারা জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করছে তারা সব ধর্মেই আছে। ‘যদি কেউ মনে করে যে তারা নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে বেহেশতে যাবে, তা কখনোই হবে না। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা বলেননি এবং আমাদের নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) তা বলেননি।

তিনি এই কথাগুলো বিশ্বাস করেন বলেনই তার সরকারের প্রথম মেয়াদে (২০০৯-২০১৩) জঙ্গিবাদ দমনে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করেন। অপরাধ দমন, অপরাধী শনাক্তকরণ, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধ, মাদকদ্রব্য চোরাচালান রোধ, মানবপাচার রোধ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে শেখ হাসিনা সরকার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু ও কৃষি ভাবনা

বাঙালী জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে অধিকার আদায়ের নিরবচ্ছিন্ন প্রেরণা যুগিয়েছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে ১০ জানুয়ারি বিজয়ীর বেশে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে এসে, নিজেকে সঁপে দেন স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে এবং অর্থনৈতিক মুক্তিলাভের সংগ্রাম। এক বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন- “আমার চাল নাই, ডাল নাই, রাস্তা নাই, রেলওয়ে ভেঙে দিয়ে গেছে, সব শেষ করে দিয়ে গেছে ফেরাউনের দল”।

যুদ্ধপরবর্তী সময়ে যখন উন্নত দেশগুলো বাংলাদেশের মাঝে কোন আশার আলো দেখতে পাননি, তখন তিনিই সর্বপ্রথম অনুধাবন করেছিলেন,

কৃষিনির্ভর এ দেশকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে হলে কৃষির উন্নতির বিকল্প নেই। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, বাংলার মাটি সোনার চেয়েও খাঁটি। তিনি দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে “কৃষক বাঁচাও দেশ বাঁচাও” স্লোগানে সবুজ বিপ্লবের ডাক দেন।

কৃষি খাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে ১৯৭২-৭৩ সালে বঙ্গবন্ধুর সরকারের প্রথম বার্ষিক বাজেটে, ৫০০ কোটি টাকার মধ্যে ১০১ কোটি টাকা শুধু কৃষি উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করেছিলেন। প্রথম বাজেটেই কৃষি ও কৃষকদের উন্নয়নে কৃষিখাতে ভর্তুকির ব্যবস্থা করেন। বাজেটে ভর্তুকি দিয়ে বিনামূল্যে কীটনাশক ও সার সরবরাহ করেন। এ ছাড়াও ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষিকর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। কৃষি পণ্য বিশেষ করে ধান, পাট, আখের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে ন্যূনতম ন্যায্যমূল্য বেঁধে দিয়েছিলেন। ব্যবস্থা করেছিলেন গরিব কৃষকদের রেশনের।
সহায়-সম্বলহীন ২২ লাখ কৃষক পরিবারের পুনর্বাসনের দায়িত্ব নেন। তাদের পুনর্বাসনে স্বল্পমূল্যে এবং অনেককে বিনামূল্যে বীজ, সার ও কীটনাশকসহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণ প্রদান করেন। ১৯৭২ সালে বাংলার ভূমিহীন কৃষকদের জন্য রাষ্ট্রপতির বিশেষ আদেশে পরিবার প্রতি জমির মালিকানা ৩৭৫ বিঘা থেকে কমিয়ে ১০০ বিঘায় করেন এবং ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করেন। ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং- ১৩৫ এর মাধ্যমে নদী কিংবা সাগরগর্ভে জেগে ওঠা চরের জমির মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে নিয়ে দরিদ্র কৃষকদের মাঝে বণ্টন করেন। বিলোপ করেন হাট-বাজারের ইজারা প্রথা।

কৃষিতে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের জন্য ১৯৭৩ সালের ৭ নং আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেন কৃষি ব্যাংক, যাতে কৃষক সহজেই কৃষি ঋণ নিতে পারে। মহাজন ও ভূমিদস্যুদের হাত থেকে গরিব কৃষকদের রক্ষাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। এ ছাড়াও কৃষিঋণ মওকুফ, সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার ও খাস জমি বিতরণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

১৯৭২ সালের শেষের দিকে স্বল্পমূল্যে কৃষকদের জন্য ৪০ হাজার অগভীর, ২ হাজার ৯শ গভীর এবং ৩ হাজার শ্যালো টিউবওয়েল স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। এর ফলে ১৯৬৮-৬৯ সালের তুলনায় ১৯৭৪-৭৫ সালে সেচের জমি এক-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৬ লাখ একরে। সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের পাশাপাশি কেবল ১৯৭২ সালেই ১৭ হাজার ৬১৬ টন উচ্চ ফলনশীল ধান ও গমের বীজ বিতরণের ব্যবস্থা করেন। এছাড়াও বিশ্ব বাজারের তুলনায় কম মূল্যে সার সরবরাহ করা হয়। এসব পদক্ষেপের ফলে

রাসায়নিক সার ৭০ শতাংশ, কীটনাশক ৪ শতাংশ এবং উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বঙ্গবন্ধুর সরকার কৃষকদের মাঝে দেড় লাখ গবাদিপশু ও ৩০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করেন। ১৯৭৩ সালে গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প পুনঃউদ্যোমে চালুর ব্যবস্থা করেন। সরকারিভাবে খাদ্য মজুতের জন্য ১৯৭২ সালের মধ্যে ১শ গোডাউন নির্মাণ করেন। কৃষিজ পণ্যের ক্ষুদ্র বিক্রেতাদের শুল্ক থেকেও অব্যাহতি দেয়া হয়েছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের আমলে। কৃষি গবেষণা ছাড়া যে কৃষির উন্নতি সম্ভব নয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে এদেশে কৃষি গবেষণাধর্মী কাজ পরিচালনার জন্য তেমন কোনো সমন্বয়ধর্মী প্রতিষ্ঠান ছিল না। তাই তো ১৯৭৩ সালেই কৃষিতে গবেষণা সমন্বয়ের শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল। সেই সঙ্গে কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে পুনর্গঠিত ও সম্প্রসারিত করেন।

সরকারের কৃষি গবেষণা বিভাগকে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুনর্গঠনের জন্য তিনিই উদ্যোগ নেন। ১৯৭৩ সালে ১০ নং আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট নামে পুনর্গঠন করেন। সেই সময় তিনি ঢাকার আণবিক গবেষণা কেন্দ্রে কৃষি পারমাণবিক গবেষণা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচার (ইনা) প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেন, যা ১৯৭৫ সালের শেষের দিকে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার এগ্রিকালচার (বিনা) হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে স্থানান্তরিত হয়।

স্বাধীনতার পর জুট অ্যাক্ট-এর মাধ্যমে প্রাক্তন জুট এগ্রিকালচার রিসার্চ ল্যাবরেটরিকে বাংলাদেশ জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউট নামে পুনর্গঠন করেন। তাছাড়া, তিনি ঈশ্বরদীতে প্রতিষ্ঠা করেন বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট। একই সঙ্গে হর্টিকালচার উন্নয়ন বোর্ড, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, তুলা উন্নয়ন বোর্ডসহ অনেক নতুন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেন শুধুমাত্র কৃষকদের নিকট সম্প্রসারণ সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য। তিনি মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন এবং বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশনের বিদ্যমান কার্যক্রম ও অবকাঠামো সম্প্রসারিত করেন। মৎস্য ও পশুসম্পদের উন্নতির জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়। এছাড়াও দুগ্ধ উৎপাদন ও বিপণন ব্যবস্থাকে তরান্বিত করতে গড়ে তোলেন মিল্ক

ভিটা। একইসাথে ভর্তুকি মূল্যে তিনি কৃষকদের মাঝে ১ লাখ হালের বলদ ও ৫০ হাজার গাভী সরবরাহ করেন। গরিব কৃষকদের মাঝে তিনি সহজ শর্তে ১০ কোটি টাকার ঋণ ও ৫ কোটি টাকার সমবায় ঋণ বিতরণের ব্যবস্থাও করেন।

১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠন করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐ নির্বাচনী জোটের অংশীদার হয়ে প্রার্থী হন কোটালিপাড়া-গোপালগঞ্জ আসনে। ঐ জোটের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির ২১ দফা কর্মসূচির মধ্যে প্রধান ছয়টি দফাই ছিল কৃষি ও কৃষক শ্রমিকদের ভাগ্যোন্নয়ন ও স্বার্থের কথা। দফাগুলো আরও বিশ্লেষণ করলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, ২১ দফা কর্মসূচিই ছিল দেশের কৃষক-শ্রমিক ও কৃষির উন্নয়নের প্রথম রাজনৈতিক দলিল। কৃষি ও কৃষকদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাাভাবনা বেশ তীক্ষ্ম ও প্রকট ছিল বলেই তাঁকে যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষি, বন, সমবায় ও পল্লীমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

কৃষির প্রতি বঙ্গবন্ধুর যে অকৃত্তিম ভালবাসা এবং উপলব্ধি তা প্রস্ফুটিত হয়েছিলো ১৯৭৫ সালের ২৬ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের এক বিশাল জনসভায় দেওয়া বক্তব্যে। সেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন- “আমার দেশের এক একর জমিতে যে ফসল হয় জাপানের এক একর জমিতে তার তিনগুণ ফসল হয়। কিন্তু আমার জমি দুনিয়ার সেরা জমি। আমি কেন সেই জমিতে দ্বিগুণ ফসল ফলাতে পারব না, তিনগুণ করতে পারব না? আমি যদি দ্বিগুণও করতে পারি তাহলে আমাকে খাদ্য কিনতে হবে না। আমি চাই বাংলাদেশের প্রত্যেক কৃষক ভাইয়ের কাছে, যারা সত্যিকার কাজ করে, যারা প্যান্টপরা, কাপড়পরা ভদ্রলোক তাদের কাছেও চাই জমিতে যেতে হবে, ডবল ফসল করুন। প্রতিজ্ঞা করুন, আজ থেকে ওই শহীদদের কথা স্মরণ করে ডবল ফসল করতে হবে। যদি ডবল ফসল করতে পারি আমাদের অভাব ইনশাআল্লাহ হবে না”।

কৃষির সার্বিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর যে দূরদর্শী চিন্তাভাবনা ছিল এবং কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা ১৯৭৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়া তার ভাষণেই ফুটে ওঠেছিল যা একটি ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে আজও সাক্ষ্য দেয়।

তিনি বলেছিলেন- “কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছি। সবুজ বিপ্লবের কথা আমরা বলছি। যুগ যুগ ধরে বাংলাদেশের যে অবস্থা, সত্য কথা বলতে কী বাংলার মাটি, এ উর্বর জমি বারবার দেশ-বিদেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে ও শোষকদের টেনে এনেছে এই বাংলার মাটিতে। এই উর্বর এত

সোনার দেশ যদি বাংলাদেশ না হতো, তবে এতকাল আমাদের থাকতে হতো না। যেখানে মধু থাকে, সেখানে মধুমক্ষিকা উড়ে আসে। সোনার বাংলা নাম আজকের সোনার বাংলা নয়। বহু দিনের সোনার বাংলা। বাংলার মাটির মতো মাটি দুনিয়ায় দেখা যায় না। বাংলার মানুষের মতো মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় না। বাংলার সম্পদের মতো সম্পদ দুনিয়ায় পাওয়া যায় না”।

তিনি আরও বলেছিলেন- “যেভাবে মানুষ বাড়ছে যদি সেভাবে আমাদের বংশ বৃদ্ধি হতে থাকে, তবে ২০ বছরের মধ্যে বাংলার মানুষ বাংলার মানুষের মাংস খাবে। সে কারণেই আমাদের কৃষির দিকে নজর দিতে হবে। আপনাদের কোট-প্যান্ট খুলে একটু গ্রামে নামতে হবে। কেমন করে হালে চাষ করতে হয়, এ জমিতে কত ফসল হয়, এ জমিতে কেমন করে লাঙল চষে, কেমন করে বীজ ফলন করতে হয়। আগাছা কখন পরিষ্কার করতে হবে। ধানের কোন সময় নিড়ানি দিতে হয়। কোন সময় আগাছা ফেলতে হয়। পরে ফেললে আমার ধান নষ্ট হয়ে যায়। এগুলো বই পড়লে হবে না। গ্রামে যেয়ে আমার চাষি ভাইদের সঙ্গে প্র্যাকটিক্যাল কাজ করে শিখতে হবে। তাহলে আপনারা অনেক শিখতে পারবেন”।

বঙ্গবন্ধু খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, কৃষিশিক্ষায় মেধাবী শিক্ষার্থী না আসলে এই খাতের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই কৃষিশিক্ষায় আকৃষ্ট করার জন্য ১৯৭৩ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (বাকসু) কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন মঞ্চে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়াদের মতো কৃষিবিদদের চাকরিক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণির পদমর্যাদা ঘোষণা করেন। সাথে সাথেই “বঙ্গবন্ধুর অবদান, কৃষিবিদ ক্লাস ওয়ান” ¯স্লোগানে স্লোগানে প্রকম্পিত হয় সেই সমাবর্তন স্থলটি। তার সেই ঐতিহাসিক ঘোষণার পথ ধরে আজ কৃষিবিদরা সরকারি চাকরিক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণির গেজেটেড পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন।

শুধু তাই নয়, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি গ্র্যাজুয়েটদের তিনি কৃষি বিপ্লব সফল করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন- “খাদ্য শুধু চাল, আটা নয়; মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, তরিতরকারিও আছে”। কৃষি উন্নয়ন বলতে তিনি শস্য, মৎস্য, পশুপাখি ও বনসম্পদ অর্থাৎ সার্বিক কৃষি খাতের উন্নয়নকে বুঝিয়েছেন। তিনি তার বিভিন্ন বক্তৃতায় আমাদের উর্বর জমি, অবারিত প্রাকৃতিক সম্পদ, পশু-পাখি, মৎস্য, বনাঞ্চল ও পরিবেশের কথাও উল্লেখ করেছেন। এসবের ওপর গবেষণা ও সম্প্রসারণ কর্মসূচির সুষ্ঠু

সমন্বয় সাধন করে তিনি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের নিদের্শনাও দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন- “খাদ্যের জন্য অন্যের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। আমাদের নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য নিজেদেরই উৎপাদন করতে হবে। আমরা কেন অন্যের কাছে খাদ্য ভিক্ষা চাইব। আমাদের উর্বর জমি, আমাদের অবারিত প্রাকৃতিক সম্পদ, আমাদের পরিশ্রমী মানুষ, আমাদের গবেষণা সম্প্রসারণ কাজে সমন্বয় করে আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করব। এটা শুধু সময়ের ব্যাপার”।

কৃষি উপকরণের বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাচেতনা যা ছিল তা আজ এত বছর পরেও আমাদের আশ্চার্যন্বিত করে। মানসম্মত বীজ উৎপাদন এবং বিতরণ, সুষ্ঠু সার ও সেচ ব্যবস্থাপনা, বালাই ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত ফসল ব্যবস্থাপনা, খামারভিত্তিক ফসল ব্যবস্থাপনা, সমবায় ভিত্তিক চাষাবাদ, বীজবিষয়ক কার্যক্রম এসবের ওপর সর্বাত্মক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কেননা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এগুলো যথাযথভাবে না করতে পারলে আমরা অনেক পিছিয়ে যাবো।

বঙ্গবন্ধুর মতোই তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বারবার দেশের জনগণের প্রতি আহ্বান করেন যে-“এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে। যে যেভাবেই পারেন, প্রতিটি ইঞ্চি জায়গার সদ্ব্যবহার করবেন”। তিনি আরও বলেন- “বাংলাদেশ এখন খাদ্য উদ্বৃত্তের দেশ। তার পরেও বসে থাকলে চলবে না”। কৃষিবিদদের মর্যাদা নতুন মাত্রায় উন্নীত করতে, কৃষিবিদ ও কৃষকের মর্যাদার প্রতীক পেশাজীবী সংগঠনের প্রাণকেন্দ্র কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটশন বাংলাদেশ-এর নান্দনিক ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে জমি বরাদ্দসহ দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। সময়ের ব্যবধানে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তারই কৃষক-কৃষিবিদ সহায়কনীতি ও প্রণোদনায় ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৩য়, সবজি উৎপাদনে ৩য়, আম উৎপাদনে ৭ম, আলু উৎপাদনে ৮ম, পেয়ারা উৎপাদনে ৮ম এবং মৎস্য উৎপাদনে ৪র্থ অবস্থানে রয়েছে। আবাদি জমি কমেছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে দ্বিগুণ কিন্তু খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৪ গুণ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ সারা বিশ্বে কৃষি উন্নয়নের এক অনুকরণীয় রোল-মডেলে পরিণত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু আজ নেই, তিনি আছেন বাংলার প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের মনিকোটায়। পূর্বের ন্যায় সেই খাদ্যের অভাব এখন আর দৃষ্টিগোচর হয় না। কৃষি উৎপাদন ডাবল, ক্ষেত্রবিশেষে তার চেয়েও বেশি হয়েছে।

নেই কোন খাদ্য সংকট। খাদ্যশস্যও এখন উদ্বৃত। এ দেশের কৃষক এখন আর শোষিত ও বঞ্চিত নন বরং তারা সম্মানিত। যেমনটি চেয়েছিলেন আজকের এই কৃষি উন্নয়নের অগ্রদূত “বঙ্গবন্ধু”।

ড. মোঃ মনিরুল ইসলাম (সোহাগ): প্রফেসর, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

বাংলাদেশের মানুষ ভয়কে জয় করতে জানে

যুক্তরাষ্ট্র গত মে মাসে ভিসানীতি আরোপের ঘোষণা দিয়েছিল। শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যায় তারা ভিসানীতি ঘোষণার কার্যকারিতার কথা জানালো। এই ভিসানীতি কার্যকারিতার কথা তারা তখন জানালো যখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের ৭৮তম অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন।
আরেকটু স্পষ্ট করে বললে, নিউ ইয়র্কের স্থানীয় সময় গত শুক্রবার জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনের ফাঁকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বেসামরিক নিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি আজরা জেয়ার এক বৈঠকে আবারও বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়।

ওই বৈঠকের পর আজরা জেয়া নিজেই এক্সে (সাবেক টুইটার) সচিত্র একটি পোস্ট দিয়েছেন। এতে তিনি লিখেছেন, ‘রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে বাংলাদেশ, কানাডা, গাম্বিয়া, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উচ্চপর্যায়ের একটি সাইড ইভেন্টের আগে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে আবারও যুক্ত হতে পেরে সম্মানিতবোধ করছি। আমরা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন, অংশীদারত্বের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি এবং ৯ লাখ ৬০ হাজার রোহিঙ্গা শরণার্থীকে উদারতার সঙ্গে আশ্রয় দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রশংসা করেছি।’

বৈঠকে আজরা জেয়া প্রধানমন্ত্রীকে জানান, তারা রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের জন্য ১১৬ মিলিয়ন ডলার

বরাদ্দ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জেয়া রোহিঙ্গাদের উন্নত জীবিকা নিশ্চিত করতে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির ওপর জোর দেন।

জবাবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন শুরু করা উচিত, অন্যথায় এই অঞ্চল নিরাপত্তা হুমকির মধ্যে পড়বে। কারণ রোহিঙ্গারা ইতিমধ্যে বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে। যার মধ্যে রয়েছে হত্যা, আগ্নেয়াস্ত্র চোরাচালান এবং মাদক কারবার। রোহিঙ্গারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে কারণ তাদের প্রত্যাবাসন দীর্ঘায়িত হচ্ছে এবং তারা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে এবং তারা সেখানে কোনো ভবিষ্যৎ অনুভব করছে না।

একটা বিষয় খেয়াল করলে বুঝা যাবে, উজারা জেয়ার সঙ্গে বৈঠকের পর পরই বাংলাদেশের উপর যুক্তরাষ্ট্র তাদের ভিসানীতি কার্যকর করার ঘোষণা দিয়েছে। এতে বুঝা যাচ্ছে রোহিঙ্গা ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের উপর চাপ প্রয়োগের চেষ্টা করেছে। তাদের দাবি ছিলো, রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেছেন, তাদেরকে নিজ দেশ ফিরিয়ে নিতে যত তাড়াতাড়ি প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত।

এ থেকে বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই যে, রোহিঙ্গাদের কর্মসংসস্থানের প্রস্তাব সরাসরি ফিরিয়ে দেওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র নাখোশ হয়েছে। এই প্রস্তাব ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আর কী কী প্রস্তাব বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে দিয়েছিল তা আমরা জানিনা। মনে হচ্ছে, এমন কিছু প্রস্তাব হয়তো প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া হয়েছিল যেগুলো তিনি নাকচ করে দিয়েছেন।

এবার আসা যাক বাংলাদেশের আগামী সাধারণ নির্বাচন প্রসঙ্গে। বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। অনেকদিন ধরে তারা সেটি বলে আসছে। বাংলাদেশের তরফ থেকেও বার বার জানানো হয়েছে যে, আগামী নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হবে। তারপরও তারা ভিসানীতি আরোপ করে সেটি কার্যকর করতে শুরু করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো- নির্বাচন তো এখনও হয়নি। তার আগেই কেন ভিসানীতি আরোপ ও কার্যকর করা হলো?

এ থেকে এটা স্পষ্ট যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য হাসিল করতেই এসব ভিসানীতি, নিষেধাজ্ঞা জারি করছে। গণতন্ত্র, অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক ভোট শুধুমাত্র ইস্যু।

নিজের দেশেই আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাদের বিরোধী পক্ষকে ঘায়েল করতে নানান কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। নিজের দেশেই যেখানে বাইডেন প্রশাসন প্রশ্নবিদ্ধ সেখানে অন্যদেশের গণতন্ত্র নিয়ে তাদের এতো মাথা ব্যাথা কেন?

বাংলাদেশেই যে তারা প্রথম ভিসানীতি আরোপ বা নিষেধাজ্ঞা জারি করে তা কিন্তু নয়। সাম্প্রতিক অতীত ঘাটলে দেখা যাবে, যুক্তরাষ্ট্র আরও বহু দেশের সরকারের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদদের উপর একইভাবে ভিসানীতি এবং নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এটা নতুন কিছু নয়। যেখানেই তাদের স্বার্থ জড়িত সেখানেই তারা একই পথে হেঁটেছে। কিন্তু কোথাও তারা সফল হতে পারেনি। সব জায়গা থেকেই ফিরেছে শুন্য হাতে। আমরা যদি ভেনিজুয়েলা থেকে শুরু করে সিরিয়া, ইরান, মিশর, তুরস্ক, রাশিয়া, বেলারুশের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো এদের সবার উপরই নিষেধাজ্ঞা জারি কিংবা ভিসানীতি আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু খুব একটা ফল হয়নি।

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপকে ক্ষমতাচ্যুত করতে ২০১৬ সালের ১৫ জুলাই সেদেশে সামরিক অভ্যূত্থান হয়েছিল। সেই অভ্যূত্থানে যুক্তরাষ্ট্র ইন্ধন দিয়েছিল। ২০২১ সালে তুরস্কের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুলেইমান সৌলু যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ধনের বিষয়টি স্পষ্ট করেন। ভেনিজুয়েলায় নিজেদের পছন্দের লোক গুইদুকে প্রেসিডেন্ট করতে না পেরে মাদুরোকে বার বার নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

পাঠকদেরকে হালের একটা তথ্য দিয়ে রাখি। যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ভারতের মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্রের উপরও। ১৯৯২ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বহাল ছিল। বারাক ওবামা ভারত সফরের পর যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। তার সফরের বেশ কিছু দিন পর ভারত নাসার সঙ্গে চুক্তি করল।
ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপরও নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। গুজরাট দাঙ্গার কারণে তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। পরবর্তিতে নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলে যুক্তরাষ্ট্র তার উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হয়।

বাংলাদেশের রাজনীতি কোন দিকে যাবে, কারা সরকার পরিচালনা করবে-সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার মালিক শুধুই বাংলাদেশের জনগণ। এখানে বাইরের

রাষ্ট্র সে যুক্তরাষ্ট্র হোক কিংবা অন্য কোনো দেশ হোক কারোরই হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। যখনই বাইরের কোনো রাষ্ট্র কোনো অজুহাতে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করবে তখনই বুঝতে হবে ওই দেশের বৃহত্তর স্বার্থ আছে। আর এসব নিষেধাজ্ঞা, ভিসানীতি আরোপে এদেশের সাধারণ মানুষের কিছুই যায় আসে না। কারণ বাংলাদেশের মানুষ নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্ত করেছে এবং করছে।

শেষ করতে চাই আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রসঙ্গ টেনে। মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অবস্থা নিয়েছিল। শুধু বিরুদ্ধেই অবস্থান নেয়নি, তারা সরাসরি পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল। সেই যুদ্ধে সপ্তম নৌবহর পর্যন্ত পাঠিয়েছিল রিচার্ড মিলহাউস নিক্সন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। তাই ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। আর আমাদের সংবাদ মাধ্যমেরও উচিত নিষেধাজ্ঞা বা ভিসানীতির বিষয়টি এতো বড় করে না দেখা। বাংলাদেশের মানুষ ভয়কে জয় করতে জানে।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

টাকা পাচার বন্ধ করে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলুন, যুব ইউনিয়ন সভাপতি মাসুম

‘কর্মসংস্থান ও ভোটাধিকারের সংগ্রামে জেগে ওঠো তারুণ্য ‘ শ্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন কুষ্টিয়া জোনের উদ্যোগে গতকাল শুক্রবার ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে যুব সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন ঝিনাইদহ জেলা কমিটির সভাপতি যুবনেতা আবু তোয়াব অপু’র সভাপতিত্বে ও বায়েজিদ চাষার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত যুব সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি খান আসাদুজ্জামান মাসুম, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডিয়াম সদস্য চৌধুরী হোসেন, খুলনা বিভাগীয় প্রেসিডিয়াম সদস্য নিত্যানন্দ ঢালী, কেন্দ্রীয় কমিটির

স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. মুজাহিদুল ইসলাম রিপন, বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতির ঝিনাইদহ জেলার আহবায়ক স্বপন বাগচী।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন কুষ্টিয়া জেলা সভাপতি গোলাম রাব্বানী, চুয়াডাঙ্গা জেলার আহবায়ক জিয়াউর রহমান, মেহেরপুর জেলার আহবায়ক এ্যাড. মিজানুর রহমান, কুষ্টিয়া জেলার সাধারণ সম্পাদক সোহেল খোন্দকার, চুয়াডাঙ্গা জেলার যুগ্ম আহবায়ক আনোয়ারুল ইসলাম, ঝিনাইদহ জেলা কমিটির সদস্য ও জাতীয় পরিষদ সদস্য সুজন বিপ্লব, ঝিনাইদহ জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফুল ইসলাম প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বাংলাদেশ যুব ইউনিয়নের ৯ দফা দাবী উপস্থাপন করেন এবং বেকারদের কর্মসংস্থানের দাবী জানান।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্য যুবনেতা মাসুম বলেন, প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে যে বিপুল পরিমান টাকা পাচার হচ্ছে এই টাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে এই দেশের কোটি বেকারের কর্মসংস্থানের সুযোগ হতো। তিনি সরকারি চাকুরির শুন্য পদে দ্রুত নিয়োগের দাবী জানিয়ে বলেন করোনার কারনে দেশে কোটি যুবক কর্মহীন হয়ে পড়েছে। তাদের বেশির ভাগ নতুন করে আর শ্রমবাজারে যেতে পারেনি, সরকার তাদের জন্য কোনো উদ্যোগ নেয় নি। অথচ রাষ্ট্রের টাকায় ধনিক শিল্পপতিদের প্রণোদনার নামে হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়েছে এতে যুব সমাজের কোনো কাজে লাগে নাই । করোনাকালীন কর্মহীন হয়ে পড়া ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত ক্ষতিগ্রস্ত যুবদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে।

করোনাকালীন প্রবাস ফেরত যুবদের প্রবাসে কর্মে ফিরে যাওয়া নিশ্চিত করতে হবে।কর্মহীন যুবদের জন্য বেকার ভাতা চালু করতে হবে। কর্ম প্রত্যাশীদের জন্য অনলাইন নিবন্ধন কেন্দ্র চালু করে নিবন্ধিত যুবদের এক বছরের মধ্যেই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। ঘুষ ছাড়া চাকরি চাই, নিয়োগ ও বদলিতে বানিজ্য বন্ধ করতে হবে।

এনটিভির উদ্দীপনামূলক পুরস্কার পেলেন রেজ আন উল বাসার তাপস

দ্রুততম সময়ে মিলিয়ন ভিউয়ের মাইলফলক অর্জন করা ভিডিও বিবেচনায় উদ্দীপনামূলক পুরস্কার পেয়েছেন এনটিভির মেহেরপুরের রেজ আন উল বাসার তাপস।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে এনটিভির প্রধান কার্যালয়ে রেজ আন উল বাসার তাপসসহ পুরস্কার প্রাপ্তদের হাতে নগদ অর্থ তুলে দেওয়া হয়। এনটিভির পরিচালক আলহাজ্ব নুরুদ্দীন আহমেদ ও মো. আশফাক উদ্দিন আহমেদ প্রত্যেক কর্মীর হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন।

এ সময় অনলাইনে যুক্ত ছিলেন এনটিভির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলহাজ্ব মোহাম্মদ মোসাদ্দেক আলী ও তাঁর কন্যা রোজা আলী সামাভিয়া। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এনটিভির সব বিভাগের প্রধান ও দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সময়ের সাথে আগামীর পথে’ বস্তুনিষ্ঠ তথ্যবহুল সংবাদ তুলে ধরার পাশাপাশি দ্রুত সময়ে তা জনসাধারণের আরও কাছে পৌঁছে দিতে কাজ করছে দর্শকনন্দিত বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এনটিভি। এরই মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্যতায় পৌঁছেছে এর ফেসবুকে পেজ, ছুঁয়েছে দুই কোটির বেশি মানুষের হৃদয়। শুধু সংবাদই না, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিশেষ মুহূর্তের ভিডিও দর্শকের মন জয় করে হচ্ছে ভাইরাল। ডিজিটাল প্লাটফর্মে মুগ্ধতা ছড়িয়ে যাদের ভিডিওচিত্র অধিক ভাইরাল হচ্ছে, তাদের উৎসাহ বাড়িয়ে দিতে উদ্দীপনামূলক পুরস্কার দিচ্ছে জনপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেলটি। তারই ধারাবাহিকতায় এনটিভির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলহাজ্ব মোহাম্মদ মোসাদ্দেক আলীর নির্দেশনায় এবার ৩৪ জন পেলেন এই পুরস্কার।